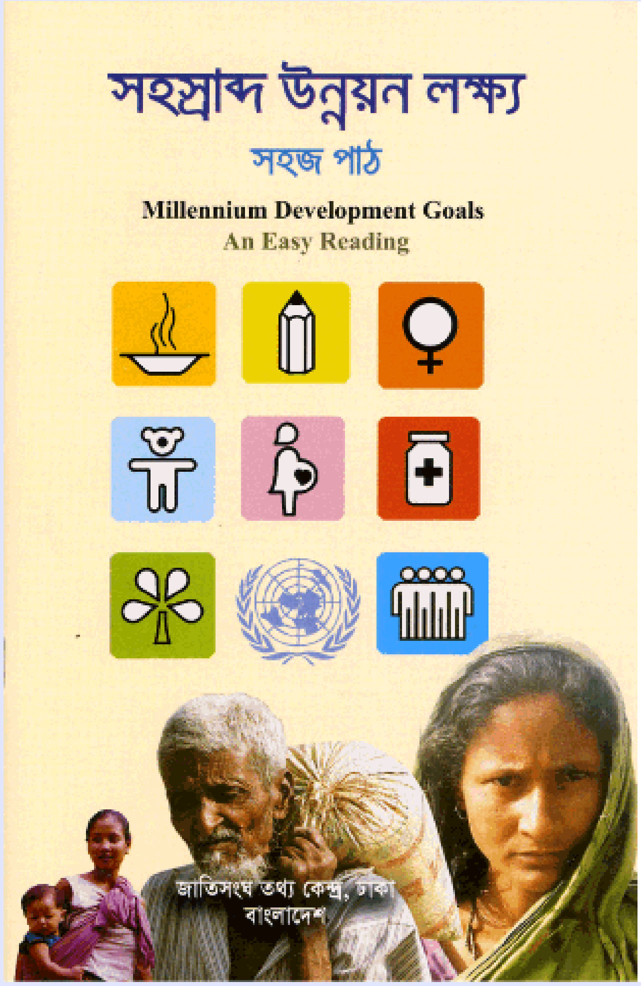
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
সহজ পাঠ
Millennium Development Goals
An Easy Reading
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
বাংলাদেশ

**সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য**
**সহজ পাঠ**

**নির্বাহী সম্পাদক :** কাজী আলী রেজা
সম্পাদনা সহযোগী : মোঃ মনিরুজ্জামান

**প্রকাশক**
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
জাতিসংঘ অফিস, আইডিবি ভবন
বেগম রোকেয়া সরণি, শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

**প্রকাশকাল :** নভেম্বর ২০০৭
**শিল্প নির্দেশনা :** সন্তু সাহা
ইউনিক/প্রকাশ/২০০৭/০৬-১০০০

**গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রোডাকশন**
হোপ মাল্টিমিডিয়া

**Millennium Development Goals**
**An Easy Reading**

**Executive Editor :** Kazi Ali Reza
Editorial Assistance : Md. Moniruzzaman

**Published by**
United Nations Information Centre, Dhaka
UN Office, IDB Bhaban
Begum Rokeya Sharani
Sher-e-Banglanagar
Dhaka-1207, Bangladesh

**Published in** November 2007
**Art Direction :** Santu Saha
unic/pub/2007/06-1000

**Graphics & Production**
Hope Multimedia


# ভূমিকা

২০০০ সালে জাতিসংঘ আহূত এক শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ২০১৫ সাল নাগাদ তাদের নিজ নিজ দেশের উন্নয়নে যে আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, তার মাঝ পথ অতিক্রান্ত হলো গত ৭ জুলাই ২০০৭। এ সহস্রাব্দ লক্ষ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সরল পাঠ হিসেবে তুলে ধরতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া এই পুস্তিকার তথ্য-উপাত্ত সব ক্ষেত্রে সর্বশেষ ও সর্বাংশে নির্ভুল নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠকের কাছ থেকে আমরা অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য-সরল ভাষায় সহস্রাব্দ লক্ষ্যগুলো স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ করা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-সহজ পাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্যতম উপকার হলেও আমাদের শ্রম সার্থকতা লাভ করবে বলে মনে করি।

কাজী আলী রেজা<br>
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র<br>
ঢাকা, বাংলাদেশ

**সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals)**

দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, শিশুমৃত্যু, যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাব, এইচআইভি/এইডস্, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার মতো রোগব্যাধিতে ব্যাপক হারে মানুষের মৃত্যু– এগুলো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের বহু বছরের সমস্যা। এ সমস্যাগুলো সমাধান করতে না পারলে বিশ্বব্যাপী মানব উন্নয়ন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সত্যিকার বিশ্বশান্তি অর্জন। এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ১৮৯টি (বর্তমানে ১৯২টি) দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণ সম্মিলিতভাবে একটি অঙ্গীকার করেন। আর তা হলো– ২০১৫ সালের মধ্যে তারা নিজ নিজ দেশে আটটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবেন।

এ আটটি লক্ষ্য হলো :

১ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ
(Eradicate Extreme Poverty and Hunger)
২ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
(Achieve Universal Primary Education)
৩ নারী-পুরুষ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ দান
(Promote Gender Equality and Empower Women)
৪ শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকরণ
(Reduce Child Mortality)
৫ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
(Improve Maternal Health)
৬ এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগব্যাধি দমন
(Combat HIV/AIDS, Malaria and Other diseases)
৭ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ
(Ensure Environmental Sustainability)
৮ সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা
(Develop global partnership for development)

এ লক্ষ্যগুলোকেই বলা হয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা Millennium Development Goals, সংক্ষেপে MDGs.

২০১৫ সালের মধ্যে এই আটটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য আবার রয়েছে ১৮টি সুনির্দিষ্ট টারগেট বা অভীষ্ট এবং ৪৮টি নির্দেশক বা সূচক। এ ১৮টি টারগেট হলো :

১. দৈনিক এক ডলারের কম আয়ের মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা
২. ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করা মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৩. সকল ছেলে-মেয়ে প্রাইমারি স্কুলে অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা
৪. সম্ভব হলে ২০05 সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল বৈষম্য দুর করা
৫. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা
৬. মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহারের অনুপাত তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস করা
৭. এইচআইভি/এইডসের বিস্তার রোধ
৮. ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রধান রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনা
৯. দেশীয় নীতিমালা ও কর্মসুচির মধ্যে টেকসই উন্নয়নের সমন্বয় করা, পরিবেশগত সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনা
১০. নিরাপদ পানীয়জলের স্থিতিশীল সুযোগ বঞ্চিত জনগণের সংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১১. ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনে তাৎপর্যপুর্ণ উন্নয়নসাধন করা।
১২. একটি অবাধ বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নসাধন– যা হবে নিয়মভিত্তিক, পুর্বাভাসযোগ্য ও বৈষম্যহীন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতিও এর অন্তর্ভুক্ত।
১৩. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মোকাবেলা করা। এর মধ্যে রয়েছে– এদের রফতানি শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশ, মারাত্মক ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর বর্ধিত পরিমাণ ঋণ মওকুফ, সরকারি দ্বিপড়্গীয় ঋণ বাতিল এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারবদ্ধ দেশগুলোর জন্য আরো উদারভাবে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা।
১৪. স্থলবেষ্টিত ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মোকাবেলা করা ....

১৫. উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ঋণের সমস্যা দুরীকরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ অব্যাহত রাখতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা
১৬. উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতায় যুবসমাজের জন্য ভদ্রোচিত ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
১৭. ওষুধ কোম্পানিগুলোর সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামর্থ্য অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করা
১৮. বেসরকারি সহযোগিতায় নতুন প্রযুক্তিগুলো বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল সহজলভ্য করা

জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনানের মতে, “জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন নয় বরং তা অর্জিত হবে প্রতিটি দেশের সরকার ও নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে”।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জিত হলে বিশ্বব্যাপী প্রায় –

- ৫০০ মিলিয়ন মানুষকে আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতে হবে না
- ৩০০ মিলিয়ন মানুষকে আর কখনো ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করতে হবে না
- ৩০ মিলিয়ন শিশু আর ৫ বছর বয়সের আগেই মারা যাবে না
- ২ মিলিয়ন নারী মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে
- আরো অন্তত ৩৫০ মিলিয়ন মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয়জলের ব্যবস্থা করা যাবে
- আরো অন্তত ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ স্যানিটেশন সুবিধার আওতাভুক্ত হবে

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এমডিজি অর্জনের পথে প্রায় অর্ধেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা হিসাব করার সময় এসেছে।

**লক্ষ্য – ১ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মুলকরণ**
এই লক্ষ্যটি নির্ধারণের উদ্দেশ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পুরণ করা– অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক, নিরাপদ পানি, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসুবিধা ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন করা।

**দারিদ্র্যের সংজ্ঞা :**

‘দারিদ্র্য মানুষের এক বিশেষ মাত্রার বঞ্চনামুলক অবস্থা। সমাজে যেসব মানুষ ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত এবং মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়, তাদেরকে আমরা দরিদ্র বলে থাকি। দারিদ্র্যকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. সহনীয় দারিদ্র্য (Moderate Poverty)
২. চরম দারিদ্র্য (Extreme Poverty)

সবচেয়ে জনপ্রিয় দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি হচ্ছে “পুষ্টি দারিদ্র্য” বা “আয় দারিদ্র্য”। বাংলাদেশের গড় আবহাওয়া অনুযায়ী একজন গড়পড়তা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন গড়ে ২১১২ ক্যালরি দরকার। ২১১২ ক্যালরিসম্পন্ন খাদ্য কেনার সামর্থ্য একজন মানুষের না থাকলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাকে দরিদ্র বলা যেতে পারে। অশিক্ষা, পরনির্ভরশীলতা, নদীভাঙন, বন্যা, খরা, বেকারত্ব, ভুমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা সমস্যা, উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের অভাব প্রভৃতিকে এদেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হওয়ায় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে কাজের ব্যাপক অভাব দেখা দেয়। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় ‘মঙ্গা’। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় শিল্পায়নের অভাব, সম্পদের অসম বণ্টন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি না হওয়া ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য নিরসন প্রত্যাশিত হারে সম্ভবপর হয়নি।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এদের মধ্যে আবার প্রায় দেড় কোটি মানুষ বসবাস করে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে বসবাস করতে হয় বলে এসকল অঞ্চলে দারিদ্র্য প্রবণতা তুলনামুলক বেশি। প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ বসবাস করে বস্তিতে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের দারিদ্র্য হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৫৮.৮%, যা হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ৪৯.৮%

এবং ২০০৫ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৪০% এ। এর মধ্যে শহর অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ২৮.৪% এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৩.৮%। ২০০০ সালে শহর ও গ্রামে দারিদ্র্যের এ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩৫.২% এবং ৫২.৩%। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ নতুন করে শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। এই পটভূমিতে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৯.৪%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সরকারকে অবশ্যই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে, কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে হবে, নতুন প্রযুক্তিগত সহায়তা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে (যেমন- বিদ্যুৎ শক্তি ও পানি সরবরাহ, পরিবহন, রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়সমূহ)। মঙ্গা এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। সরকারি নীতি ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করে সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

**লক্ষ্য – ২ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন**

এই লক্ষ্যটি অর্জনের উদ্দেশ্য ২০১৫ সালের মধ্যে সব ছেলেমেয়ে যাতে প্রাইমারি স্কুলে পূর্ণ শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করা। শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ভবিষ্যতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। শিক্ষা প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দ অনুযায়ী একটি সুন্দর জীবন গড়ে নেয়ার সুযোগ দেয়। শিক্ষিত নারী স্বল্পসংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয় এবং সন্তানকে যথাযথভাবে বড় করে তুলতে পারে। তা ছাড়া শিক্ষার সাথে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায়–

- ১১৫ মিলিয়ন শিশু স্কুলে যায় না–যাদের ৫৬ ভাগ হচ্ছে মেয়ে এবং ৯৪ ভাগ উন্নয়নশীল দেশের।
- ১৩৩ মিলিয়ন তরুণ লিখতে–পড়তে পারে না।
- ১৫৫টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মাত্র ৩৭টি দেশ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৫ সালে এ হার ছিল ৮৭.২৭% এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ছিল ৬৫% (বাংলাদেশ সরকার–ইউএনডিপি জনপ্রতিবেদন ২০০৬)। আদমশুমারি ২০০১ অনুযায়ী এ দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার ৪৭.৫%। আশার কথা হলো, বর্তমানে প্রায় ৯৮% মেয়ে এবং ৯৭% ছেলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্তি হয়। ৬–১০ বছর বয়সী মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের হার প্রায় ৮০%। প্রায় ৭৩% মেয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। বর্তমানে সরকার মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু করেছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৮২ হাজারেরও বেশি পাবলিক ও নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ৩০ হাজার অ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় রয়েছে।

তবে সাক্ষরতার হার বাড়লেও সে তুলনায় শিক্ষার গুণগত মান খুব একটা বাড়েনি। আশঙ্কাজনক হলেও সত্যি, সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৪৮%। ধারণক্ষমতার তুলনায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রতি ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ১ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। প্রায় ২৮% শিক্ষক কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই শিক্ষাদান করছেন। দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা এর পেছনে অনেকাংশে দায়ী। তা ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতাও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করছে।

**কিভাবে তরুণরা অংশগ্রহণ করতে পারে?**

শিক্ষা তরুণদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বাড়ায় এবং তাদের কণ্ঠকে সোচ্চার করে। দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক তরুণই চববৎ উফঁপধঃড়ৎ হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছে। যেসকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেসকল প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে শিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়েকে স্কুলে যাওয়ার কথা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের অঙ্গীকার পালনে সাহায্য করতে পারে।

**লক্ষ্য – ৩ নারী–পুরুষ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ দান**

নারী–পুরুষ সমতা বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষ সবাই যেন জীবনযাপনের মান উন্নয়নের সকল সুযোগ একইভাবে পায় তা নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাপী পুরুষদের তুলনায় নারীরা জীবনযাপনের অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একজন নারী জন্মের পর থেকে জেন্ডার অসমতার শিকার হয় এবং পরবর্তীকালে সারা জীবন তাকে বিভিন্নক্ষেত্রে নারী হওয়ার কারণে সুবিধাবঞ্চিত হতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে নবজাতক ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর মৃত্যুহার বেশি যার প্রধান কারণ জন্মের পর মা–বাবার অবহেলা। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলত্যাগের হার অনেক বেশি। বিশ্বের ৮৮০ মিলিয়ন অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের তিন ভাগের দুই ভাগ নারী। পুরুষদের তুলনায় নারীদের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের হারও অনেক কম। সারা বিশ্বে পার্লামেন্ট সদস্যদের মাত্র ১৬% নারী। আর বাংলাদেশে এ হার মাত্র ২ ভাগ।

নারীর প্রতি অসমতা দুর করা না গেলে এমডিজি’র কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব হবে না। কারণ প্রতিটি লক্ষ্যই নারীর অধিকার নিশ্চিত করার

সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিভিন্ন গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েশিশুর শিক্ষায় অধিক হারে বিনিয়োগ করা হলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তবে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন কেবল নারীদের একার দায়িত্ব হতে পারে না। পুরুষদেরও এই যুদ্ধে শামিল হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাক, একটি ফুটবল টিম শুধু তার অর্ধেক খেলোয়াড় নিয়ে খেলছে। তাহলে কি দলটি কোনো দিন খেলাটি জিততে পারবে? কাজেই নারীদের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন কখনোই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ছেলেমেয়ে উভয়ের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার প্রায় সমান হলেও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষ অংশগ্রহণের অনুপাত ৩৬:৬৪। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক নারী তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব, অবদমনমূলক আইন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কারণে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। শ্রমশক্তি সমীক্ষার ১৯৯৯-২০০০ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, 'কাজ'-এর প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার ২৩.১%। যদিও বিগত এক দশকে অকৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তবু এ অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। তাই নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে বাংলাদেশকে এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

## লক্ষ্য – ৪ শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকরণ

শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৫০ জনে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যটির উদ্দেশ্য শিশুরা জন্মের পর থেকে যেসব স্বাস্থ্যসমস্যায় ভোগে সেগুলো দুর করে শিশুমৃত্যুহার হ্রাস করা।
উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতিদিন ৩০,০০০ শিশু প্রতিরোধযোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শিশুমৃত্যুহার ১০% কমেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি দশটি শিশুর একজন পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যায়, যেখানে উন্নত বিশ্বে এই হার ১৪৩ জনে ১ জন। শিশুরা প্রধানত যেসকল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সেগুলো হলো– ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস।
বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে শিশুমৃত্যু অত্যন্ত দ্রুতহারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০ সালের শিশুমৃত্যু হ্রাসের হার ছিল ২.৬%, আর ২০০০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬%-এ। মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০১ অনুযায়ী ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১৪৪ জন, কিন্তু বর্তমানে এ হার প্রতি হাজারে মাত্র ৬০ জন এবং এ হার প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় কম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে নবজাতক মৃত্যুর হার ছিল প্রায় প্রতি হাজারে ৯৪ জন। বর্তমানে এ হার প্রতি হাজারে ৫১ জনে নেমে এসেছে। বাংলাদেশকে লক্ষ্য অর্জনে ২০১৫ সালের মধ্যে নবজাতক মৃত্যুর এ হার প্রতি হাজারে ৩১ জনে নামিয়ে আনতে হবে। এক বছর বয়সী হামের টিকা গ্রহণকারী শিশুর আনুপাতিক হার ১৯৯০ সালে ছিল প্রতি ১০০ জনে ৫৪ জন, আর ২০০৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭ জনে। নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্য খাতে সরকারের অগ্রাধিকার বৃদ্ধি, টিকাদান কর্মসূচি প্রভৃতি এ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

এ থেকে বোঝা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জন দুরূহ কোনো কাজ নয়।

### তরুণরা যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারে :

তরুণরা শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তরুণরা তাদের সমবয়সীদেরকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এসব বিষয়ে অনুপ্রাণিত ও পথ প্রদর্শন করতে পারে। বিভিন্ন কেস স্টাডি শোনানো এবং তার ওপর প্রশ্ন করার মাধ্যমে এ বিষয়ে মানুষকে কথা বলায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যখন তরুণরা তাদের চার পাশে কী ঘটছে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে তখনই তারা এসব সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে।

## লক্ষ্য – ৫ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

এ লক্ষ্যটির উদ্দেশ্য মায়েদের সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াটি নিরাপদ করার মাধ্যমে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানজনিত কারণে মাতৃমৃত্যুহার কমিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুহার (প্রতি ১ লাখ জীবিত শিশু জন্মদানে) ১৪৩ জনে নামিয়ে আনা। এ ছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বা ধাত্রীদের দ্বারা প্রজননসেবা গ্রহীতার হার ৫০ ভাগে উন্নীত করা, প্রতি হাজারে জন্মহার ২০২ জনে নামিয়ে আনা, মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা ২ বছর বৃদ্ধি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।
সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ লাখেরও বেশি নারী গর্ভধারণ ও সন্তানজন্মদান জনিত জটিলতার কারণে মারা যান এবং তাদের ৯৫ ভাগই আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর অধিবাসী। ৫০ মিলিয়ন নারী প্রজননস্বাস্থ্য সংশি-ষ্ট মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগছে। পুর্ব এশিয়ায় কিছুটা অগ্রগতিসাধিত হলেও সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া এ লক্ষ্য অর্জন থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছে।
বাংলাদেশে গত ২০ বছরে মাতৃমৃত্যুর হার প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে প্রায় ৫৪৬ জন। 2002 সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে প্রায় ৩২০ জনে। এ হারে অগ্রগতি হলে ২০১৫ সাল নাগাদ এ হার হবে প্রতি হাজারে প্রায় ২২৭ জন। এ ছাড়া এ সময়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রজননসেবা গ্রহণের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। এখনো এ দেশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি গর্ভবতী নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ পায় না। জনগণের সচেতনতার অভাব এর পেছনে অন্যতম কারণ। ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুর কারণ ২০% ক্ষেত্রেই সন্তান প্রসবজনিত জটিলতা। ৭০% নারী অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতার শিকার (বাংলাদেশ মেডিকেল সার্ভে ২০০১)। এমতাবস্থায় ২০১৫ সালের মধ্যে এ লক্ষ্যটি অর্জন করতে হলে সরকারকে এখনই দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**তরুণরা যেভাবে ভুমিকা রাখতে পারে :**

কম বয়সী মায়েরা মাতৃত্বজনিত জটিলতা এমনকি মৃত্যুর শিকার বেশি হয়। অধিকসংখ্যক তরুণকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতায় সংশি-ষ্ট করতে পারলে এ সমস্যা সমাধান দ্রুততর হবে। নারীদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিলে তারা সমাজের গুরুত্বপুর্ণ সদস্য হিসেবে ভুমিকা রাখতে পারবে।

**লক্ষ্য – ৬ এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগব্যাধি দমন**

এই লক্ষ্যটির উদ্দেশ্য ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস্, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা।
বর্তমান বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৩ মিলিয়ন। প্রতিদিন সারা বিশ্বে প্রায় ৭০০০ শিশু-কিশোর এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কেবল ২০০৬ সালে এ রোগে আক্রান্ত হয় প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন মানুষ। আর একই বছর সারা বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে প্রায় ২.৯ মিলিয়ন মানুষ। আশঙ্কাজনক হলেও সত্যি নতুনভাবে এইচআইভি আক্রান্তদের প্রায় শতকার ২৫ ভাগেরই বয়স ১৫-২৪ এর মধ্যে। সাব-সাহারান আফ্রিকায় এই চিত্র সবচেয়ে ভয়াবহ। সেখানে ১৬-২৪ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার একই বয়সের ছেলেদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় ১ মলিয়ন এরও বেশি। এর ৯০% মানুষই সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিবাসী। সারা বিশ্বে যক্ষায় প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছে এবং এই হার প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম প্রাণঘাতকে রূপ নেবে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় দরিদ্র দেশগুলোয় এইচআইভি/এইডস্, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা- প্রতিটিরই চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ।

বাংলাদেশে আপাতদৃষ্টিতে এইডস্ পরিস্থিতি তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্ব, বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান যাতায়াত এবং পুর্ব ভারতের এইডস্প্রবণ অঞ্চল দ্বারা সীমানা বেষ্টিত হওয়া, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের মতো দেশ থেকে প্রচুর পর্যটক প্রতি বছর বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করা এবং অনিরাপদ আচরণ (যার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়)-এর কারণে বাংলাদেশ প্রচ এইডস্ ঝুঁকির মুখে রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.০১% মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত। বেসরকারি হিসাব মতে, দেশে অন্তত ১৫,০০০ মানুষ দেহে এইডসের জীবাণু বহন করছে। তবে দেশের প্রকৃত এইডস্ চিত্র আরো ভয়াবহ হতে পারে। কারণ নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, রক্ত পরীক্ষায় অনীহা ও অজ্ঞতার কারণে অনেক এইডস্ রোগীই অসুখের কথা গোপন রাখে।

ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫ অনুযায়ী মহিলা যৌনকর্মী, রিকশাচালক ও ট্রাকচালকদের মধ্যে জন্মনিরোধক ব্যাহারের হার যথাক্রমে ২-৪%, ২% এবং ২৫%। সমীক্ষায় দেখা যায়, সুচ বা ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকসেবীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪%। কেননা শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রেই মাদকসেবীরা একই সুচ বা ইনজেকশন একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করে থাকে। মাদকসেবীদের অনেকেই আবার পেশাদার রক্তদাতা হিসেবে বিভিন্ন সময় রক্ত দিয়ে থাকে। ফলে এইচআইভি সংক্রমণ ধারাবাহিকভাবে এবং দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ইউএনএইডস্ ও ডবি-উএইচও প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন মানুষ এইচআইভি ঝুঁকির মুখে রয়েছেন।
এ ছাড়া ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৩ অনুযায়ী ২০০১ সালে প্রতি হাজারে ২১১ জন যক্ষ্মা এবং প্রতি হাজারে ৪০ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী ছিল। এসব রোগ প্রতিরোধে সরকারের সচেতনতামুলক কর্মকান্ড অব্যাহত থাকলেও জনগণের মধ্যে সচেতনতার হার এখনো অতি নগণ্য।

**তরুণরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে :**

বিশ্বব্যাপী প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে ৬ জন তরুণ এইচআইভি-এ আক্রান্ত হচ্ছে। তরুণদের প্রয়োজন তথ্য এবং রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত শিক্ষা, যাতে সংক্রমণের আশঙ্কা এবং রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। তরুণরা ইতোমধ্যে ঐওঠ ও অওউঝ প্রতিরোধে অনেক কর্মকা সংশি-ষ্ট হয়েছে; কিন্তু আরো অনেক সংশি-ষ্টতার প্রয়োজন। অনেক তরুণের মধ্যে ঐওঠ ও অওউঝ সংক্রান্ত ভুল ধারণা ভাঙাতে কাজ করছে। অনেকে সরকারি নীতিতে এর প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্তকরণের কারণে প্রয়োজনীয় প্রকল্প সম্পন্ন করতে সুবিধা হচ্ছে। বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার, এনজিও ও যুবসংগঠনগুলোকে সমন্বিত ভুমিকা রাখতে হবে।

**লক্ষ্য – ৭ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ**

পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়ন বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবশগত স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হওয়ার কারণে পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর তাই পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের টার্গেট ২০১৫ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে ১০০% এবং গ্রামে ৯৫.৫% জনগণ যাতে নিয়মিতভাবে নিরাপদ পানি সংগ্রহের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা, ২০১০ সালের মধ্যে দেশের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে উন্নততর পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার

আওতায় নিয়ে আসা, জাতীয় নীতি ও কর্মসুচিতে টেকসই উন্নয়নের নীতিমালা সমন্নিত করা এবং পরিবেশগত সম্পদের ক্ষতি রোধ করা।

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা বিরাট অংশ এখনো জীবন ধারণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মানুষের নিরাপদ পানীয়জলের স্থিতিশীল উৎস নেই (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫)। উন্নয়ন বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষকে শহরের অপ্রতুল আবাসন ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীল কাজের অভাবের কারণে বস্তিগুলোর আশ্রয় নিতে হয়। বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। তা ছাড়া গ্রিনহাউজ এফেক্ট, উর্ধ্বাকাশে ওজোনস্তরের ক্ষয়, কলকারখানা, যানবাহন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেনসহ নানা ধরনের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ প্রভৃতি কারণে আবহাওয়ামণ্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং সারা দুনিয়ায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা, পাকিস্তানে পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে একের পর এক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

বাংলাদেশে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অথচ ২০০৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে তা আছে মাত্র ১০ ভাগ।

**কী করা প্রয়োজন?**

গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা অর্জনের তাৎপর্যপুর্ণ উন্নতিসাধন করা হয়েছে কিন্তু স্বল্পসংখ্যক দেশেই ২০১৫ সালের মধ্যে ৭ম লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা (যথেষ্ট অগ্রগতির করছে) হচ্ছে। পরিবেশগত স্থিতিশীলতাকে শিক্ষাগত কার্যক্রম এবং সকল কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এর প্রভাবকে প্রতিনিয়ত অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
অনিরাপদ পরিবেশে বসবাসকারি মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে, যা কিনা তাদের নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকরী হবে।

আশার কথা হলো, সরকার ইতোমধ্যেই সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসুচি হাতে নিয়েছে। সরকারি-বেসরকারিভাবে নেয়া হচ্ছে আরো নানা ধরনের উদ্যোগ। এর ফলে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবহার বাড়ছে। তবে শহরের তুলনায় গ্রামে এ হার অনেক কম।

২০১৫ সালের মধ্যে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে আরো ব্যাপক প্রচারকাজ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে একে শিক্ষাগত কার্যক্রম এবং সকল কর্মপন্থার সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং এর প্রভাব প্রতিনিয়ত অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

তরুণরা যেভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে :

**সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-৭**

অর্জনে একজন সচেতন কিশোর-কিশোরী যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন :

- নিজের পরিবারের সকলকে এবং বন্ধুবান্ধবদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতে পারে। বিশেষ করে শহরে থাকলে বারান্দার টবে বা বাসার ছাদে গাছ লাগাতে পারে।
- অ্যারোসল, এয়ারফ্রেশনার, ফোম, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি কম ব্যবহার করা এবং ব্যবহার করলে তাতে 'ওজোনবান্ধব' ব্যবহার করা হচ্ছে কি না-এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন করতে পারে।
- রাস্তার পাশে কিংবা বাড়ির আশপাশে অব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত জায়গায় গাছ লাগিয়ে নিজেরাই সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে।
- প্রয়োজনের বেশি জ্বালানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। সম্ভব হলে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এই শক্তির উৎস বায়োগ্যাস, সুর্যের আলো, বায়ু বা জলবিদ্যুৎ। এর মধ্যে বায়োগ্যাস তৈরি সবচেয়ে সহজ। রান্নাঘরের ফেলে দেয়া আবর্জনা এবং মানুষ ও পশুর বর্জ্য থেকে এ গ্যাস তৈরি হয়।
- আশপাশের মানুষকে যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া রোধ করার কথা বলতে হবে।
  স্কুল-কলেজে ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীরা গ্রুপ করে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারকাজ চালাতে পারে।

**লক্ষ্য – ৮ সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা**

এমডিজি’র অষ্টম লক্ষ্যটির উদ্দেশ্য ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দরিদ্র দেশগুলোকে জাতীয় আইন ও নীতিমালায় সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন, দুর্নীতি দমন এবং যুবসমাজের জন্য উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে ধনী দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শুল্ক হ্রাস ও ঋণ মওকুফের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে :

- ইউরোপের গবাদিপশু দিনে ২ ডলার ভর্তুকি পায় যা বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর আয় অপেক্ষা বেশি।
- উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭% সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; মাত্র ৫টি রাষ্ট্র তা রক্ষা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র দিচ্ছে মাত্র ০.২%
- যদি উন্নত দেশগুলো বাণিজ্য বাধা প্রত্যাহার করত তবে ২০১৫ সাল নাগাদ ৩০০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেত।

কয়েক দশক আগেই ধনী দেশগুলো তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৭% উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা হিসেবে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৫টি ইউরোপীয় দেশ এটি বাস্তবায়ন করেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ১৪৭টি দেশ সম্প্রতি প্রথমবারের মতো কৃষিপণ্যের রপ্তানি শুল্ক মওকুফের ব্যাপারে একমত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, এই উদ্যোগ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে আরো ১২০ মিলিয়ন ডলার যোগ করবে। আশার কথা, বিশ্বব্যাপী অষ্টম লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনকার ৫টি দেশ ছাড়াও আরো ৫টি দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জাতীয় আয়ের ০.৭% উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা হিসেবে দেয়া শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (আয়ারল্যান্ড ২০০৭, বেলজিয়াম ২০১০, ফ্রান্স-স্পেন ২০১২ এবং যুক্তরাজ্য ২০১৩ সাল নাগাদ এটি বাস্তবায়ন করবে)। তবে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে আরো ৫০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন যার অর্থ উন্নত দেশগুলোকে বর্তমান আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে।

### কী করা প্রয়োজন

যেসব রাষ্ট্রের প্রয়োজন সর্বাধিক তাদেরকেই সাহায্যপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তা হতে হবে সহজ শর্তে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দাতারাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করলে তা হবে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিকূল। উন্নত দেশগুলোর উচিত তাদের বাজার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করা; বর্তমান বাণিজ্যনীতি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য বৈষম্যপূর্ণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষ- যারা সংখ্যায় ৯০০ মিলিয়ন- জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর ভর্তুকি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, ফলে ফসলের মূল্যহ্রাস হয় এবং কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের পথ সঙ্কুচিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অধিক ঋণ মওকুফ তাদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এমডিজি অর্জনের নিয়ামকগুলোতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দে উৎসাহিত করবে।

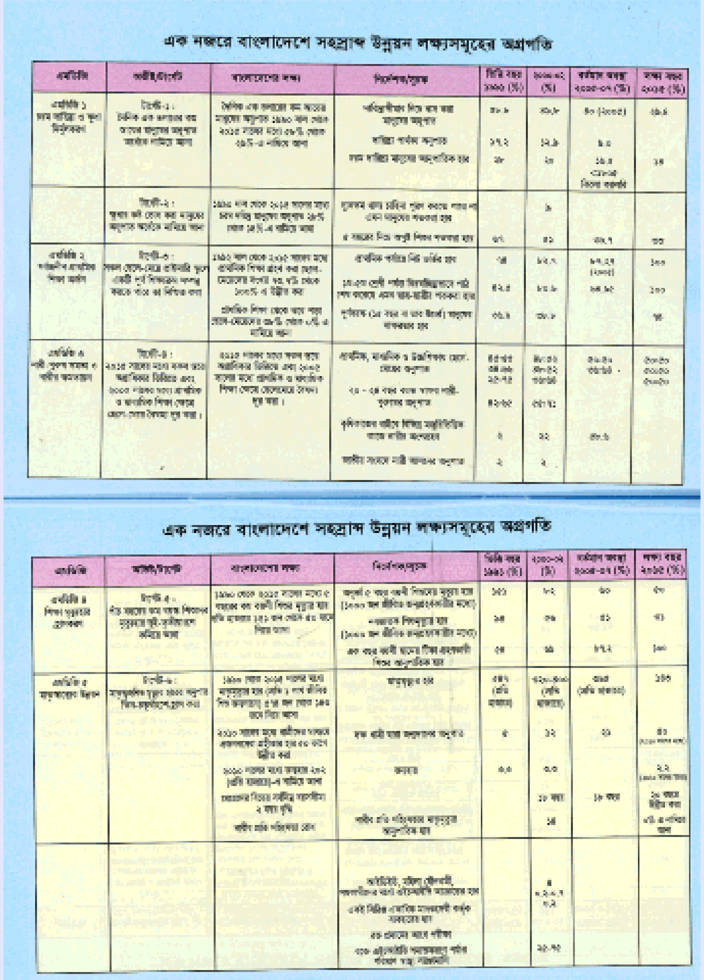
এক নজরে বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি
এক নজরে বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি

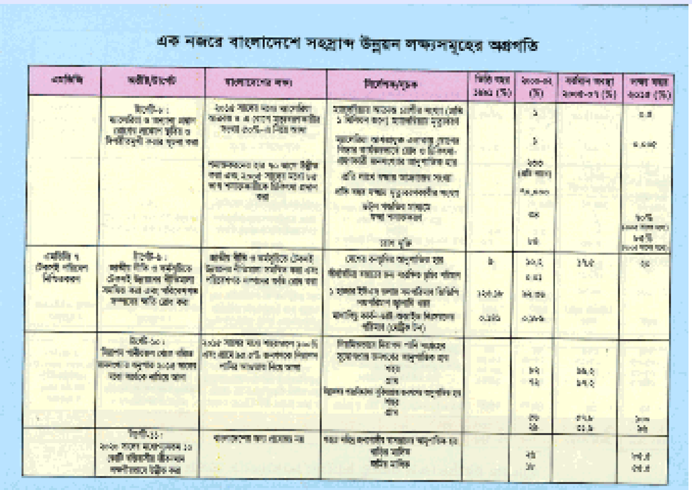

## এক নজরে বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি

| এমডিজি | অভীষ্ট/টার্গেট | বাংলাদেশের লক্ষ্য | নির্দেশক/সূচক | ভিত্তি বছর ১৯৯০ (%) | ২০০৩-০৪ (%) | বর্তমান অবস্থা ২০০৮-০৯ (%) | লক্ষ্য মাত্রা ২০১৫ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

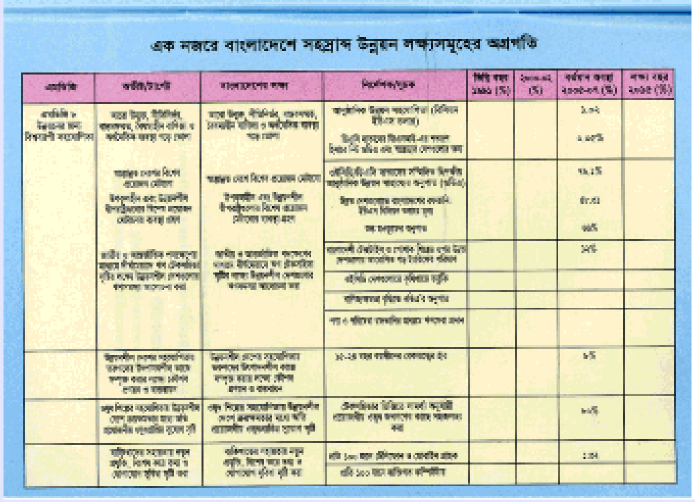

## এক নজরে বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি

| এমডিজি | অভীষ্ট/টার্গেট | বাংলাদেশের লক্ষ্য | নির্দেশক/সূচক | ভিত্তি বছর ১৯৯০ (%) | ২০০৩-০৪ (%) | বর্তমান অবস্থা ২০০৮-০৯ (%) | লক্ষ্য মাত্রা ২০১৫ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|